ATHENA, VOLUME IV, JULY 2020 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 103-111
www.athenajournalcbm.in

ভারতবর্ষে লিঙ্গবৈষম্য: সাংবিধানিক ও আইনানুগ প্রেক্ষাপটে এক সম্যক বিশ্লেষণ

অনিমেষ চৌধুরী*

প্রাপ্ত: ৩১/০৫/২০২০ পরিমার্জন: ১৫/০৬/২০২০ গৃহীত: ২৮/০৬/২০২০

সারসংক্ষেপ: *'লিঙ্গ' শব্দটি হল একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। অন্যদিকে লিঙ্গবৈষম্য শব্দটি শুধুমাত্র নারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ নারীরা এই বৈষম্যের শিকার হন সবথেকে বেশি। জনসংখ্যার অর্ধেকের কাছাকাছি নারী হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত। নারীদের উক্ত ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়ন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এই বৈষম্যের সমাধান সম্ভব। পাশাপাশি সমাজের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই লিঙ্গবৈষম্যকে দূর করতে গেলে দরকার নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন। তাই লিঙ্গ সমতা ও নারী ক্ষমতায়নের মত বিষয়কে সমাজে একসঙ্গে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বহুভাষা, ধর্ম, জাত, বর্ণ, শ্রেণি সমন্বিত রাষ্ট্রে এটি বাস্তবায়িত করা কঠিন। যেখানে আমরা দেখছি প্রতিনিয়ত নারীরা কিভাবে শোষণ এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন সামাজিক অপশক্তির দ্বারা। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীদের প্রতি বৈষম্যের অবসান ঘটাতে স্বাধীনতার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে সংবিধান বিভিন্ন সদর্থক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমান আলোচনার মধ্য দিয়ে নারী স্বার্থ বিরোধী বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি অপসারণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন সাংবিধানিক ব্যবস্থা, সময় উপযোগী বিভিন্ন আইন, রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন সদর্থক পদক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে নারীর ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশ ও সামগ্রিক উন্নয়নের বাস্তবায়ন সম্ভব।*

সূচক শব্দ: *লিঙ্গবৈষম্য, অংশগ্রহণ, নারী-ক্ষমতায়ন, নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন, সাংবিধানিক ও আইনগত বিভিন্ন ব্যবস্থা, রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ।*

* স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কান্দী রাজ কলেজ, মুর্শিদাবাদ।
e-mail: chowdhurysubho1993@gmail.com

ভূমিকা

লিঙ্গ বৈষম্য এবং সেইসূত্রে নারীর অবমূল্যায়ন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার একটি জ্বলন্ত সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের মত রাষ্ট্রে যেখানে সমাজ বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও শ্রেণীতে বিভক্ত সেখানে নারীরা কিভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে সেটাই একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন হিসেবে উঠে এসেছে। ঔপনিবেশিক শাসনাধিনে থাকাকালীন সময়ে ভারতীয় নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। উক্ত সময়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের আধিপত্য, নারীদের নিরক্ষরতা, ধর্মীয় কুসংস্কার সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা- নারীদের অবস্থানকে একটি প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে ছিল। এইসময় নারীকে গণ্য করা হত কেবল জননী এবং গৃহবধূ রূপে। প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা যেমন সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পুরুষদের একাধিক বিবাহ প্রভৃতি নারীদের অবস্থানকে আরও সংকটের সম্মুখীন করেছিল। স্বাধীনতার পূর্বে নারীরা যে সকল ক্ষেত্রে পশ্চাত্পদ ছিল, স্বাধীনতার পর সেই সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা হয় সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে লিখিত সাংবিধানিক আইন ও তার স্বীকৃতি নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে সহায়ক। তাই ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য এবং নির্দেশমূলক নীতিতে উল্লিখিত বিভিন্ন ধারায় নারীদের লিঙ্গগত সাম্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধান কেবলমাত্র নারীদের সমতার দাবিকেই রক্ষা করে না পাশাপাশি রাষ্ট্রকে নারীদের ক্ষমতায়নের স্বপক্ষে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতেও সাহায্য করে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে গৃহীত বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা, পদক্ষেপ, আইন সবই নারীদের অগ্রগতিতে সাহায্য করে থাকে।

নারী সুরক্ষায় মৌলিক অধিকার

মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানের ন্যায় ভারতের সংবিধানেও মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ১২-৩৫ নম্বর ধারায়। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার গুলি কেবল স্বীকৃতই নয় তা আইন দ্বারা সংরক্ষিত। সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই নারী ও পুরুষ উভয়েই সমানভাবে মৌলিক অধিকার গুলি ভোগ করতে পারে। মৌলিক অধিকারগুলি নারী ও পুরুষ সকলের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত অধিকার গুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য হওয়ায় নারীরা তাদের অধিকার খর্ব হওয়ার জন্য আদালতের নিকট প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উপস্থিতির কারণে সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতাকে বজায় রাখার জন্য নারীদের অধিকারকে পুরুষেরা তাদের ইচ্ছেমতো ক্ষুণ্ণ করতে পারেনা।

মৌলিক অধিকারের মধ্যে উল্লিখিত যে সকল ধারা নারী ক্ষমতায়নে সাহায্য করেছে নিম্নে তা আলোচিত হল:

- ১৪ নম্বর ধারা- যেসমস্ত আদর্শ গণতন্ত্রকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল সাম্য। সমাজে সাম্যের মাধ্যমে সর্বস্তরে মানুষের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখা হয়। সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা অনুসারে ভারতের ভূখণ্ডের ভিতরে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' এবং 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার'কে অস্বীকার করতে পারবে না। অধিকারটি সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয় নারীরা যে অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণের শিকার হতেন তার যথাযথ প্রতিকার এবং সমাজে তাদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করতে উক্ত ধারাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্বে সংবিধান স্বীকৃত অধিকারের উপস্থিতি না থাকার জন্য সমাজে প্রচলিত আইন, প্রথা-পুরুষতন্ত্রের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকে নারীরাও সমানভাবে আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেলেন। আইনের দৃষ্টিতে সমতার মধ্যে দিয়ে সমাজে যে লিঙ্গ বৈষম্য

প্রকট হয়ে উঠেছিল তা অবসানের চেষ্টা করা হল। সংবিধানের প্রণেতাগণ সাংবিধানিক বিভিন্ন আইনকে নারী-ক্ষমতায়নের রক্ষাকবচ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাই ১৪ নম্বর ধারায় উল্লিখিত আইনের দৃষ্টিতে সাম্য অথবা আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার- উভয়ই নারীদের সার্বিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

- ১৫(১) নম্বর ধারা- সংবিধানের ১৫(১) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।[১] স্বাধীনতার পূর্বে সমাজে যে বিভেদ, বৈষম্য, জাতিগত বিদ্বেষের অবস্থান ছিল, সংবিধান বিশেষজ্ঞদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠল এই অবস্থান থেকে ভারতবর্ষকে কিভাবে মুক্ত করে সমাজে সাম্যের অবস্থা বজায় রাখা যায়। সাম্য বলতে সকলের জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করাকে বোঝায়। অর্থাৎ, সাম্যের ধারণা তখনই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে যখন রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। উক্ত ধারার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র বা সরকার উভয়ই পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নারীদের প্রতি সমস্ত বৈষম্যমূলক আচরণকে নিষিদ্ধ করবে।

- ১৫(৩) নম্বর ধারা- সমাজে সকলেই সমান - এই ধারণাকে প্রকৃত অর্থে সাম্য বলা চলে না। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে সমাজে যারা অপমানিত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ তাদের উচ্চস্তরে উন্নীত করা রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই উক্ত ধারায় রাষ্ট্র সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছেয়ে পড়া স্ত্রীলোক, শিশুদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা কখনই সাম্যনীতির বিরোধী বলে গণ্য হবে না। ফলে সমাজে নারীরা প্রতিনিয়ত যে অসাম্যের শিকার হয়ে এসেছে তার অবসান ঘটানোর জন্য রাষ্ট্র সংবিধানের মাধ্যমে উক্ত এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

- ১৬ নম্বর ধারা- নারীদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক দিক থেকে সাম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও সমানাধিকারের প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ একজন নারী যতক্ষণ না পর্যন্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। বিষয়টি মাথায় রেখে সংবিধান প্রণেতাগণ সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে সকলের সমান সুযোগের কথা বলেছেন।[২] একমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে নারীরা তাদের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করতে পারবে। তথাকথিত প্রচলিত প্রবাদ নারী মানেই গৃহস্থালির কাজ, শিশু প্রতিপালন এবং স্বামীর সেবা করবে,- এই ধারণার অবসান উক্ত ধারার সঠিক বাস্তবায়নের ফলে সম্ভব। নারী ক্ষমতায়নে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের মধ্যে দিয়ে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ কমিয়ে সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

উপরিউক্ত ধারাগুলি ছাড়াও ১৯, ২৩, ২৫ নম্বর ধারা নারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, শোষণের বিরুদ্ধে ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সদর্থক ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই মৌলিক অধিকার গুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য হওয়ায় তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে বিচারবিভাগ প্রতিবিধানের অধিকার (৩২,২২৬)-এর মধ্যে দিয়ে তা ফিরিয়ে দিতে পারে।

নারী ক্ষমতায়নে নির্দেশমূলক নীতি

সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে সংবিধানে ৩৬ থেকে ৫১ নম্বর ধারায় উল্লিখিত নির্দেশমূলক নীতি গুলির ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশমূলক নীতিতে গান্ধীজীর আদর্শকে বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়েছে। গান্ধীজী এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি স্বাধীনতার আগে ও পরে নারীদের ক্ষমতায়নের উপর সবথেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নিম্নে

নির্দেশমূলক নীতির বেশকিছু ধারা আলোচিত হল—

- ৩৯ (ক) নম্বর ধারা- জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দরকার। রাষ্ট্র বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য জীবনধারণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবে এবং নারীরা যেন কোনোভাবেই জীবনধারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তা দেখবে।[৩]
- ৩৯ (ঘ) নম্বর ধারা- সমান কাজের জন্য সমান মূল্য যখন প্রদান করা সম্ভব হবে তখনই দেশে প্রকৃত বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব। সমাজে এই বৈষম্যের মূল নিহিত রয়েছে এই বৈষম্যমূলক মজুরি ব্যবস্থার মধ্যে। পূর্ব ধারণা অনুযায়ী নারীরা তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও দৈহিক শক্তিতে পুরুষদের সমকক্ষ নয়, -এই ধারণাকে বশবর্তী করে এখনও নারীরা একই কাজের জন্য সমান পরিশ্রম করলেও অল্প মজুরিতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ৩৯ (ঘ) নম্বর ধারায় নারী ও পুরুষের জন্য কর্মক্ষেত্রে সমান কাজের জন্য সমান মজুরী নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে।
- ৩৯ (ঙ) নম্বর ধারা- রাষ্ট্রকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে প্রত্যেক ব্যক্তি, নারী ও শিশুদেরকে এমন কোনো কাজে নিযুক্ত করা না হয় যে কাজ তার বয়স এবং পরিবেশ তার পক্ষে অনুকূল নয়।
- ৪২ নম্বর ধারা- সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বর্তমান সময়ে হয়তো কর্মক্ষেত্রে নারীদের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কাজের পরিবেশ এখনও নারীদের অনুকূল নয়। কর্মক্ষেত্রে এখনও নারীদের শোষণ-বঞ্চনা, নিপীড়ন, অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তাই উক্ত ধারায় রাষ্ট্র নারীদের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।
- ৪৫ নম্বর ধারা- শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে যেন নারীরা বঞ্চিত না হয় তার জন্য সংবিধান চালু হওয়ার প্রথম দশ বছরের মধ্যেই উক্ত ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র ৬ বছরের নীচের বালক বালিকাদের জন্য বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। ফলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে চলে আসা প্রচলিত ধারাকে সংশোধন করে যদি নারীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় তবেই তারা সমাজে বা রাষ্ট্রে তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পারবে।
- ৪৬ নম্বর ধারা- সমাজে নারীদের অবস্থান উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর শ্রেণী, তপশিলি জাতি, উপজাতি এই নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। আর্থসামাজিক দিক থেকে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা তাদের অধিকার রক্ষায় যতটা সচেতন ও সচেষ্ট, তেমনি বাকি অংশের নারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিন্তু এক নয়। তাই উক্ত ধারার মধ্যে দিয়ে এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষের বিশেষ করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তপশিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণীর মানুষদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক স্বার্থের উন্নতিবিধান এবং তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো সামাজিক অন্যায় ও অন্যান্য শোষন থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। ফলে সমাজের সকল স্তরের নারীদের সার্বিক উন্নয়ন ও ঘটে চলা সামাজিক অন্যায়ের অবসান সম্ভব হবে।
- ৪৭ নম্বর ধারা- সমাজে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নও ঘটাতে হবে। ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে শিশু ও নারীরা অপুষ্টির শিকার হচ্ছেন। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও পুরুষদের তুলনায় নারীরা বঞ্চিত হয়ে থাকেন। উক্ত ধারা অনুযায়ী বৈষম্য দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্র নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাবে ও পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দেবে যাতে করে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধিত হয়।[৪]

মৌলিক কর্তব্য ও নারী

প্রতিটি রাষ্ট্র যেমন তার নাগরিকদের জন্য বেশকিছু অপরিহার্য অধিকার প্রদান করে থাকে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের নাগরিকদেরও বেশ কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় থাকলে সমাজব্যবস্থা

সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারে। সংবিধানে মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতির মত মৌলিক কর্তব্যের মধ্যেও কয়েকটি কর্তব্য ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে সাহায্য করেছে।

৫১-(ক) এর (ঙ)- সমাজে সকল বিভেদ বৈষম্যের অবসান ঘটানো, ঐক্য, সৌভ্রাতৃত্ববোধকে প্রসারিত করা রাষ্ট্র এবং তার প্রতিটি নাগরিকদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হওয়া উচিত। নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এই কর্তব্যের আওতায় পড়ে। উক্ত মৌলিক কর্তব্য অনুযায়ী ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত, শ্রেণীগত বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ও নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সমস্ত প্রথাকে পরিহার করতে হবে।

সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। যেকোন দেশের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে বাস্তবায়িত করে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ উভয়ই হতে পারে। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই এই ধারণা প্রচলিত আছে যে রাজনীতি হল কেবল 'পুরুষদের বিষয়'। ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশ যেখানে জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত বিভেদ রয়েছে সেখানে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হার যে স্বাভাবিক ভাবেই নিম্নমুখী হবে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু করে বর্তমান সময়েও রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় অনেকটাই কম। শুধুমাত্র আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সমকক্ষ হলেই নারী ক্ষমতায়নের বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে তেমনটি নয়, এটি সম্পূর্ণ করতে গেলে দরকার রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ। সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য শুধুমাত্র নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ নয়, প্রয়োজন নির্বাচিত হওয়ার অধিকার। সরকারের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে নারীদের নীতি রূপায়ণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেদের সামিল করতে হবে। যত বেশি সংখ্যক নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আইনসভায় যাওয়ার সুযোগ পাবে, ততই সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও নারী ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। কারণ একজন নারী তাঁর আইনসভায় যথাযথ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে তাদের সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও প্রতিকার করতে পারবে। তাই সংবিধান বিশেষজ্ঞরা রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বেশকিছু ধারাকে ১৯৯২ সালের ৭৩ ও ৭৪ তম সংশোধনকে যুক্ত করলেন।[৫]

- ২৪৩ -ঘ (৩, ৪) নম্বর ধারা - উক্ত ধারা অনুযায়ী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে নারীদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নারীদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য নারীর ভোটাধিকারের সঙ্গে নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে পূর্ববর্তী ধারণা অনুযায়ী, রাজনীতি মানেই পুরুষদের বিষয় তাকে খন্ডন করা হয়েছে। উক্ত ধারায় পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সংরক্ষিত আসনের অন্তত এক তৃতীয়াংশ উক্ত জাতির নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সকল পঞ্চায়েতে এক-তৃতীয়াংশ পদে (প্রধান, সভাপতি, সভাধিপতি) নারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট থাকবে। এই ব্যবস্থা স্বীকৃতি পাওয়ার পরে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে অতীতের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলি নারীদের দ্বারা সুন্দর ভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ পঞ্চায়েতের পাশাপাশি শহরাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন পরিচালনার জন্য নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হয়েছে ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মধ্যে দিয়ে। নিম্নে উক্ত ধারা গুলি আলোচনা করা হল —

- ২৪৩ - ন (৩, ৪) নম্বর ধারা- উক্ত দুটি ধারার মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিতে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ উক্ত সম্প্রদায়ের নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পৌরসভার এক তৃতীয়াংশ আসন (তপশিলি জাতি ও উপজাতি নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ) নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়াও রাজ্য আইনসভার প্রণীত আইন অনুসারে পৌরসভার সভাপতির পদও সংরক্ষিত থাকবে। এই ধারার মাধ্যমে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর নারীদের জন্য নির্বাচিত হওয়ার অধিকারের পাশাপাশি পঞ্চায়েত ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিতে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যের যে বিস্তার ঘটেছিল তার অবসান ঘটানো হয়।

আইন অনুমোদিত অধিকার ও নারী

■ **পরিবার সংক্রান্ত আইন এবং নারী**

- বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৪) এবং হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫)- উক্ত আইনের মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয়ে নারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। যেমন বিবাহের উপযুক্ত বয়স, বহুবিবাহ, বৈধ-অবৈধ বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, খোরপোষ, বিধবা বিবাহ, পণপ্রথা, জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই আইনের সাহায্যে নারীদের অবস্থানের কিছুটা উন্নতি সাধন করা হয়েছে ঠিকই তবে তা নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

■ **সম্পত্তির অধিকারে নারী**

- হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকার/ উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬)/ সংশোধন ২০০৫– উক্ত আইনে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজে নারীদের সাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পিতার সম্পত্তিতে কেবল তার পুত্র সন্তানের অধিকার থাকবে এই ব্যবস্থাকে পরিহার করা হয়। পিতার সম্পত্তিতে পুত্র সন্তানের পাশাপাশি কন্যা সন্তানদেরও সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্বামী মারা যাওয়ার পর তার সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যাদের পাশাপাশি তার বিধবা পত্নীকে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

■ **নারী সুরক্ষায় ফৌজদারি আইনসমূহ**

- পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন (১৯৬১)- পণপ্রথা ভারতীয় সমাজে এক দীর্ঘকালীন স্থায়ী অসুখে পরিণত হয়েছে। এখনও সমাজে নারীদের পণ্যসামগ্রীর মত ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা বর্তমান। এই সমস্যার সমাধান করতে সমাজে নারীদের সাম্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য পণ প্রথা নিষিদ্ধ আইন চালু করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের পণ, সম্পত্তি, দ্রব্য নগদ অর্থ এই সমস্ত লেনদেন সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করা হয়েছে। নারীদের সামাজিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে উক্ত আইনটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বর্তমানে পণপ্রথাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
- পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন (২০০৫)- নারী ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে গেলে তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করলেই হবেনা তার সঙ্গে প্রতিনিয়ত পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি যে অন্যায়,অত্যাচার, নির্যাতন চলছে সেগুলিকে বন্ধ করতে ভারতীয় সংসদ ২০০৫ সালে আইনটি চালু করে।
- নারীদের অশালীন উপস্থাপনার নিষিদ্ধ আইন (১৯৮৬)- সমাজে নারীদের সম্মান, মর্যাদা, সামাজিক নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সহিষ্ণুতা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য ১৯৮৬ সালে এই আইনটি চালু হয়। যেখানে বলা হয় একজন নারীর চিত্রকে অশ্লীলভাবে কোন জায়গায় প্রকাশিত, বিক্রয় করা যাবেনা, কারণ তা নারীদের নৈতিকতা

ও মূল্যবোধের ওপর আঘাত আনে। কিন্তু যদি বিষয়টি সমাজের উপযোগী বা ভালোর জন্য হয় তাহলে তা প্রকাশিত করা যেতে পারে। তাই উক্ত আইনটি সমাজে নারীদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও শালীনতাকে অটুট রাখতে সাহায্য করে।

- ইভ-টিজিং (Eve-teasing) বা নারীদের উত্যক্ত করা প্রতিরোধ বিধান **(IPC 294, 509)**- ভারতীয় দন্ডবিধির ২৯৪, ৫০৯ নং ধারার সাহায্যে কোন নারীর প্রতি অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, মন্তব্য, গান প্রভৃতি উত্তক্ত মূলক আচরণ করার জন্য কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছরের কারাদন্ড দেওয়া যায়।

■ **কর্মজীবী নারীদের জন্য বিশেষ আইন**

- মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন (১৯৬১)- কর্মক্ষেত্রে নারীদের মাতৃত্বকালীন অধিকারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য একজন নারীকে সন্তান জন্ম দেওয়ার আগে ও পরে মাতৃত্বকালীন ছুটি ও বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়।[৬]
- সমমজুরি আইন (১৯৭৬)– ১৯৭৬ সালের সম মজুরি আইন এর মধ্যে দিয়ে নারী-পুরুষ প্রত্যেককেই সমান কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে এই আইনটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এর আওতায় পড়ে।
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের উপর যৌন হেনস্থা (প্রতিরোধ, নিষিদ্ধকরণ এবং প্রতিকার) আইন (২০১৩)- কর্মস্থলে নারীদের উপর যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আইনটি চালু করা হয়। ফলে নারীরা কর্মস্থলে স্বাধীন ও যথাযথভাবে তার দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে।

■ **নারীদের প্রজননগত ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকার**

- প্রসূতি নারীদের সুবিধার জন্য আইন (১৯৬১)- কর্মে নিযুক্ত একজন নারী সন্তান জন্ম দেওয়ার আগে ও পরে মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। যার মধ্যে দিয়ে সে নিজের এবং তার সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হতে পারে। এই আইনের সাহায্যে নারীরা সামাজিক দায়িত্বের পাশাপাশি পারিবারিক দায়িত্ব যাতে পালন করতে পারে তার দিকে নজর দেওয়া হয়।
- গর্ভপাতের অধিকার (১৯৭২)- গর্ভপাতের বিষয়টি নারীদের স্বার্থ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত গর্ভপাত সম্পর্কিত বিষয়টি ফৌজদারি ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত। ১৯৭২ সালে আইনটি কার্যকরী করা হয়। উক্ত আইনে সন্তানসম্ভবা একজন নারীকে তার গর্ভপাতের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে গর্ভপাতকারী চিকিৎসক হবে একজন নিবন্ধীকৃত ডাক্তার।
- ভ্রূণের জন্মপূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণ (নিয়ন্ত্রণ ও অপব্যবহার নিবর্তন) সংক্রান্ত সংশোধন আইন (১৯৯৪)- উক্ত আইনে নারী সন্তানদের বাঁচাতে ক্রমাগত ঘটে চলা ভ্রূণ হত্যা কে বন্ধ করতে এবং সমাজে নারী, পুরুষ লিঙ্গের অনুপাতের ভারসাম্য বজায় রাখতে জন্মের পূর্বে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ,হত্যা কে তাই আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হল।

■ **নারী ও সামাজিক রীতিনীতি**

- বাল্যবিবাহ আইন (২০০৬)- ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশে লিঙ্গবৈষম্যের কারণই হল মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ সম্পন্ন করা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যেভাবে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হচ্ছে তাতে নারীর সার্বিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এই প্রথা চালু থাকলে একজন নারী শুধুমাত্র তার পারিবারিক জীবনের মধ্যেই সীমিত থাকবে এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক দিক থেকে সে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তাই ভারত সরকার ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া ১৯২৯ সালের আইনটি সংশোধিত করে ২০০৬ সালে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ

আইন চালু করল। এই ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকবে তাদের অপরাধী বলে গণ্য করে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করা এবং সমাজে নারীদের সুস্থ ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকারকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

- যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষায় আইন (২০১২)- এই আইনের মাধ্যমে ১৮ বছরের নিচের শিশুদের সকল প্রকার যৌন নিপীড়ন, যৌন হয়রানি প্রভৃতি অপরাধের হাত থেকে সুরক্ষা এবং অতি দ্রুত আইনি সহায়তা লাভের ব্যবস্থা করা হয়।
- তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত আইন (২০১৭)- ভারতীয় মুসলিম নারীদের অবস্থা সমাজে অন্য নারীদের তুলনায় শোচনীয় ছিল। ১৯৯৩ সালের মুসলিম বিবাহ আইন অনুযায়ী একজন বিবাহিত মুসলমান নারীকে এক নিশ্বাসে তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ এর মাধ্যমে খুব সহজেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যেত। স্বাধীনতার পরেও ভারতবর্ষে এই প্রথা চালু ছিল। তবে সাম্প্রতিক কালে মুসলিম নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট ২০১৭ সালের ২২শে আগস্ট এই প্রচলিত তালাক প্রথাকে বাতিল করেছে। সুপ্রিম কোর্ট এই প্রথাকে অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং অধর্মীয় বলে ঘোষণা করেছে।[৭]

ভারতীয় সমাজে নারীদের সমান অধিকার প্রদান, বৈষম্য দূরীকরণ, তাদের প্রতি ঘটে চলা হিংসা, বিদ্বেষ এবং কর্মক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতির জন্য রাষ্ট্র এরকম বেশকিছু আইন প্রণয়ন করে চলেছে। এই সমস্ত আইনের উদ্দেশ্যই হল নারীদের জন্য গৃহীত সাংবিধানিক অধিকার গুলিকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা।

নারীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক পদক্ষেপ

- নারীদের জন্য জাতীয় কমিশন প্রতিষ্ঠা - ১৯৯০-এর দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিশেষ করে ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থান ও অধিকার নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যে পীড়িত নারীদের সমস্যার সমাধানের জন্য মহিলা কমিশন গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়, যার ফলশ্রুতি ১৯৯২ সালের ৩১ শে জানুয়ারি।[৮] কমিশন নারীদের সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার গুলিকে রক্ষা, সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বঞ্চনার প্রতিকারে সাহায্য করবে।
- কন্যা সন্তানদের জন্য গৃহীত বেশকিছু পদক্ষেপ - কন্যা সন্তানদের রক্ষা, বাঁচার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, সার্বিক বিকাশ সাধন ও সর্বোপরি ভবিষ্যৎ জীবনকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য এই জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-
- শিশু জন্মের আগে ও পরে তার সঠিক যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- কন্যাভ্রূণ হত্যা রুখতে জন্মের আগে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ কে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।
- যৌন নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষা প্রদান (পকসো)।
- সকল শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা।
- প্রান্তিক শিশুদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

সুতরাং নারী ক্ষমতায়নকে বাস্তবায়িত ও সমাজ থেকে লিঙ্গবৈষম্যকে দূরীভূত করার জন্য ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক দ্বারা বেশকিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন -

- বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও পরিকল্পনা।
- নির্ভয়া পরিকল্পনা।
- নারী শক্তি পুরস্কার পরিকল্পনা।
- মহিলা শক্তি কেন্দ্র পরিকল্পনা।
- মহিলা-ই -হাট পরিকল্পনা।

মূল্যায়ন

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে সাম্প্রতিককালে লিঙ্গবৈষম্য সংক্রান্ত আলোচনা শুধুমাত্র দেশেই নয় আন্তর্জাতিক স্তরেও বিস্তার লাভ করেছে। এই বৈষম্যের অবসান ঘটলেই সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রগঠন সম্ভব হবে। তাই ভারত সরকার দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা অসাম্যকে দূর করতে নারীদের প্রতি সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে এবং পুরুষতান্ত্রিকতার অবসান ঘটাতে সাংবিধানিক ও আইনগত বেশ কিছু সদর্থক পদক্ষেপ কার্যকরী করতে উদ্যোগী হয়। এই সমস্ত পন্থা অবলম্বনের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে সমাজে নারীদের মর্যাদার অবস্থানগত উন্নতি সাধিত হয়েছে। তবে একথা বলতে হয় যে রাষ্ট্র, সাংবিধানিক নীতি, আইন নারীদের পাশে থাকলেও তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব নারীদেরই। একমাত্র তাহলেই এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব। নাহলে শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন ও সাংবিধানিক রীতি নীতির মাধ্যমে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। নারীরা যদি মানসিকভাবে বন্দীত্ব স্বীকার করে নেন তবে কোনো আইনই তাদের মুক্ত করতে পারবে না। তাই এই বৈষম্য অবসানের দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই নিতে হবে। যার প্রথম সোপান হবে শিক্ষা, মুক্তচিন্তার চর্চা এবং সুস্থ মূল্যবোধের বীজ বপন। আর যার শেষ সোপান হবে আলোকোজ্জ্বল এক প্রভাত, যেখানে নারী প্রকৃতই হয়ে উঠবে সমাজের অর্ধেক আকাশ।

সূত্র নির্দেশ:

১. কাশ্যপ, সুভাষ সি., (১৯৯৬), *আমাদের সংবিধান,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৭।

২. মুখোপাধ্যায়, শক্তি, মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী, (১৯৯৪), *ভারতের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা,* ওয়ার্ল্ড প্রেস ,পৃ. ৭৯।

৩. দালাল, প্রণব কুমার, (২০২০), *ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি,* বুক সিন্ডিকেট (প্রা:) লিমিটেড, পৃ. ৬৩।

৪. Basu, Durga Das, (1960). *Introduction to the Constitution of India,* Lexis Nexis India, p. 89.

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, (২০০৯), *রাজনীতি ও নারীশক্তি ক্ষমতায়নের নব দিগন্ত,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স , পৃ. ১৯৩।

৬. মুখোপাধ্যায়, সোমা, (২০০৮), *অধিকার থেকে ক্ষমতায়ন,* মিত্রম, পৃ. ৪০।

৭. সরকার, কল্যাণ কুমার, (২০১৮), *নারীবাদ লিঙ্গ রাজনীতি ও নারীর ক্ষমতায়ন,* এভেনেল প্রেস, পৃ. ৯৯।

৮. Hanumanthappa, D.G. (2015). Constitutional and Legal Provision for Women in India, *International Journal of Multidisciplinary Research and Development,* p. 475.